শ্রীরামকৃষ্ণসূত্র

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়

একটি মজার ব্যাপার এই যে, সনাতন ধর্ম— যাকে আমরা এখন হিন্দুধর্ম বলি—তা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়। এটি জীবনযাপনের অঙ্গ, জীবনদর্শন। প্রতিটি দর্শনের একটি সিদ্ধান্ত থাকে; এই দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি বা মোক্ষ। মুক্তি কীসের থেকে? আমাদের সীমাবদ্ধতা থেকে। আমাদের শরীর, মন, বুদ্ধির সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি অনন্তের ব্যাপ্তিতে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে। আমাদের জীবনে শাস্ত্রানুমোদিত দশবিধ সংস্কার শুধু আমাদের এই পথে চালিত করার জন্য। সংস্কার মানেই উন্নততর অবস্থাকে গ্রহণ করা, নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে এগিয়ে চলা।

এগোনো মানেই পেছনে ফেলে আসা অনেক কিছু, তাই স্বাভাবিক ত্যাগই এগোনোর নিরিখ। প্রশ্ন ওঠে, আমরা সীমাবদ্ধই হই আর যাই হই, তাতে অসুবিধা কোথায়?

অসুবিধা একটাই, সেটি হচ্ছে আমাদের নিরন্তর দুঃখভোগ। দুঃখভোগের কারণ আমাদের সীমাবদ্ধতা; সেটি আমরা বুঝতেও পারি, তবে তার প্রকাশ ঘটে ভিন্নভাবে। কোনও মানুষই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, সে কিছু হয়ে উঠতে চায়। অর্থে, নামে, যশে সে সবাইকে ছাড়িয়ে সীমাহীনতার পথে চলতে চায়। ইংরেজিতে মানুষ তাই—Human Being. সে বিবর্তনে মানুষ হয়েই থেমে যায়নি, সে নিরন্তর হয়ে ওঠার সাধনায় নিমগ্ন। তবে এই আকাঙ্ক্ষা যে অসীম, অনন্ত, আমাদের প্রকৃত স্বরূপে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তা আমরা বুঝতে পারি না। সনাতন ধর্ম সেটি আমাদের বুঝিয়ে দেন ও আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্ম যেন জ্ঞাতসারে সেই উদ্দেশ্যে করা হয়—এই সিদ্ধান্তটি শুধু উপদেশে সীমাবদ্ধ না রেখে, জীবনে আমাদের চলার পথটিকে সাজিয়ে দেন নিয়ন্ত্রিত কর্মের মাধ্যমে।

কিন্তু এতে আমাদের জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হয় না। মনে হয়, আমরা যদি অনন্তই হয়ে থাকি তাহলে আমাদের এই সীমাবদ্ধতার বোধে ফেলে দুঃখভোগ করানোই বা কেন? এ নিয়ে একটি গল্প আছে। ঈশ্বর সর্বদা একা থেকে যেন একঘেয়েমিতে ভুগছেন। তাই তিনি স্থির করলেন, তিনি আর-এক সত্তার সৃষ্টি করে তার সঙ্গে খেলা করবেন। অতএব তিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা নিজেকে যেন দুভাগ করলেন। একভাগ ঈশ্বর, আর অপরভাগ যেন ঈশ্বর নয়। একজন অসীম আর অপরজন যেন সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই দুভাগের মধ্যে একটি বিভাজক বা আড়াল দরকার। মায়াশক্তি সেই আড়ালটি একটি বৃহৎ পাঁচিলের আকারে করলেন যা ঈশ্বরকে আড়াল করে রাখল। কিন্তু 'ঈশ্বর নয়'-এর সত্তা যেহেতু ঈশ্বর তাই তাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে, নাহলে সে ওই পাঁচিল পার হতে চাইবে। তাই মায়া এই আবরণ শক্তি ছাড়া আর-এক শক্তি প্রয়োগ করলেন—বিক্ষেপ শক্তি। এর বলে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণের জগৎ তার বৈচিত্র্য নিয়ে তাকে রূপে রসে মুগ্ধ করে রাখল। এই মুগ্ধতার জন্যই আমাদের সীমাবদ্ধতার বোধ থাকলেও তা আমাদের উপাদেয় বোধ হয়। তাই আমরা এই বন্ধনমুক্তি আন্তরিকভাবে চাই না। শাস্ত্রমতে এই বন্ধন আট রকম, নাম 'অষ্টপাশ'। কথামৃতে (১৮৮৪-র ২৫ মে) দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, ''অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা—এই সব।'' আবার লীলাপ্রসঙ্গকার জানিয়েছেন, ঠাকুরকে বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করে সুখাসীন হয়ে ধ্যানমগ্ন হতে দেখে হৃদয় যখন তাঁকে উন্মাদ ঠাওরালেন, তখন ঠাকুর বলেছিলেন, ''তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান—এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে।'' এই কটি পাশ বা বন্ধন মানুষকে একটি ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব দিয়েছে।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় একেবারে প্রাথমিক ও শক্ত বাঁধন। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে ঈশ্বরলাভের কোনও সম্ভাবনা নেই। আমাদের লজ্জাবৃত্তির উৎস আমাদের আবরণ উন্মোচনের আশঙ্কা থেকে। আমরা আমাদের নানাভাবে আবৃত করে রাখি নিজের স্বরূপকে আড়াল করে রাখার জন্য। স্থূল শরীরকে আবৃত করি যাতে তাকে সুন্দর দেখায়। সূক্ষ্ম শরীরের মন, বুদ্ধি, চিন্তাভাবনাকে নানা আরোপ দিয়ে আড়াল করি অপরের কাছে বিশেষ হয়ে ওঠার জন্য। আমরা আসলে যেরকম, তা নানা ভান-ভণ্ডামিতে ঢেকে রাখি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এটি কোনওভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়লে আমাদের যে-বৃত্তিটি জাগে তার নাম লজ্জা। সেই পরমাত্মাই কর্ম সংস্কারের আড়ালে জীবাত্মা হয়েছেন, আবার সেই জীবাত্মাকে নানা আরোপে আবৃত করে, একটি মিথ্যা অহংয়ের আশ্রয় দিয়ে তাকে ক্রমশই নিজের স্বরূপ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া মায়ার বিক্ষেপ শক্তির কাজ। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ আসলে লজ্জাহরণের প্রক্রিয়া। গোপীদের সব চলে গিয়েছিল, কেবল লজ্জাবৃত্তি দিয়ে নারীসত্তার ভেদটুকু ছিল। এই ভেদটুকু না গেলে তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছিলেন না, কারণ সেখানে লিঙ্গভেদ নেই।

ঘৃণা বস্তুটির উৎস নিজের এই শরীরটি ছাড়া আর সবকিছুর ওপর আত্মবোধের অভাব থেকে। শরীরী স্তরে দেহের বর্জ্য যতক্ষণ শরীরের মধ্যে আছে, ততক্ষণ তার ওপর আত্মবোধ আছে, তাই তাকে ঘৃণা হয় না, কিন্তু তা বাইরে গেলেই ঘৃণার উদ্রেক করে। আমাদের গ্রহণ-বর্জনের ইচ্ছা থেকেই হেয়-উপাদেয় বোধ। আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষার অনুকূল হলে তা উপাদেয় আর প্রতিকূল হলে তা হেয়—এই বৃত্তি আমাদের জন্মগত। কিন্তু আজ যেটি

উপাদেয় সেটিই আবার কালের প্রভাবে হেয় বলে নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং সর্বদা হেয় বা উপাদেয় বলে কিছু হয় না। তাই ঘৃণা বস্তুটির সেরকম ভিত্তি নেই, কিন্তু এই বৃত্তিটি শরীর-মনকে আশ্রয় করে ‘আমি সকলের চেয়ে বড়’ এই ভাবনায় আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে ফুলিয়ে আমাদের সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এই বিচ্ছিন্নতাই আত্মার বিস্তারের পথে বাধা, যে-বিস্তার আমাদেরকে মুক্তির পথে নিয়ে চলে। গুরু শিষ্যের অহংকারকে দূর করার জন্য আদেশ দিলেন, ‘‘যাও, তোমার চেয়ে হেয় যে-বস্তু তা নিয়ে এস।’’ শিষ্য যে-বস্তুর কাছেই যায় তারই কোনও না কোনও গুণ দেখে যা তার নিজের নেই। শেষে নিজের বিষ্ঠার কাছে হাজির। কিন্তু তাকে স্পর্শ করার আগেই সে চিৎকার করে বলে উঠল—‘‘আমায় ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, আমি অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য ছিলাম কিন্তু তোমার সংস্পর্শে এসে আমার এই দশা। আবার তোমার স্পর্শে আমার কী ঘটবে তা কল্পনাও করতে পারি না।’’ শিষ্য বুঝল যে জগতে হেয় সে-ই, আর কেউ নয়। ঠাকুর বলছেন, ‘‘কারুর নিন্দা করো না—পোকাটিরও না।’’

ভয়ের উৎস মৃত্যুভয় থেকে। আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের বিনাশ আমাদের অস্তিত্ব হারাবার ভয়। একে আমরা মৃত্যু বলে জানি। ভয় মানেই হারাবার ভয়, যা কিছু আমরা জগতে নিজের বলে মনে করি তার সঙ্গেই একটি হারাবার ভয় যুক্ত হয়ে থাকে, তা নিজের প্রাণই হোক বা অর্থ, সম্পদ, নাম, যশ যাই হোক। হারাবার ভয় আসে আসক্তি থেকে। প্রাণ হারাবার ভয় দেহে আসক্তি থেকে, অর্থ-সম্পদ হারাবার ভয় বিষয়ে আসক্তি থেকে, এরকম সর্বত্র। ভয়ের সঙ্গে আসক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, আর আসক্তি ঈশ্বরমুখী হওয়ার পথে প্রথম বাধা। তাই আসক্তি ত্যাগের কথা বলেন শাস্ত্র। যার হারাবার কিছু নেই তার ভয়ও থাকে না, তাই বৈরাগ্যই একমাত্র অভয় দিতে পারে—‘‘সর্বং বস্তুং ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।’’

শ্রীরামকৃষ্ণ যা নিজে পালন করেননি তা বলেননি। সাধনার একেবারে প্রথম দিকে হৃদয় তার মামা গদাইয়ের ছায়াসঙ্গী। কিন্তু ঠিক সন্ধের সময় ঘণ্টা দুই মামাকে সে দেখতে পায় না। সেসময় পঞ্চবটীর পিছনে গভীর জঙ্গল—সাপখোপ, শেয়ালের আড্ডা, দিনের বেলাতেও লোক ভেতরে ঢোকে না। সেখানে সে একদিন আবিষ্কার করে যে মামা কাপড়, পইতে খুলে রেখে ওই ঝোপে ধ্যান করছেন। হৃদয় আশেপাশে ঢিল ছুঁড়ে মামাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে বিফল হয়। তখন ভেতরে ঢুকে পইতে কাপড় খুলে এভাবে ধ্যান করার জন্য অনুযোগ করলে মামা বললেন, ‘‘তুই জানিস, লজ্জা একটা বন্ধন? পইতেও—আমি ব্রাহ্মণ এই অভিমানে অপরকে ছোট ভাবতে শেখায়।’’ আর ভয় তো নেই, কারণ এই সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূত-প্রেত, সাপখোপ যে মামাকে ভয় দেখাতে পারছে না সেটা তো হৃদয় দেখেই নিয়েছে। শাস্ত্র পড়তে হয়নি, গদাইয়ের শুদ্ধ অন্তরে এই জ্ঞানের ফুট আপনিই উঠেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীমা কিন্তু মহিলা ভক্তদের বলতেন, ‘‘যার আছে ভয় তারই হয় জয়। আমি বলি, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে হয়।’’ কথাটি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও এর প্রয়োগ ভিন্ন প্রেক্ষিতে। সূত্রটিও ঠাকুরের কাছ থেকেই পাওয়া। লক্ষ্মীদিদি নেচে গেয়ে অপরকে নকল করে সবাইকে আনন্দ দেন। তিনি মায়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। পাছে তাঁর প্রভাবে শ্রীমা প্রভাবিত হন তাই ঠাকুর শ্রীমাকে ডেকে বললেন, ‘‘তুমি যেন লক্ষ্মীর লয়ে লয় দিয়ে লজ্জা ভেঙোনি।’’ আবার বলেছিলেন, ‘‘লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।’’ আসলে মেয়েদের লজ্জা জগতের ভোগদৃষ্টি থেকে রক্ষাকবচের মতো। লজ্জার আড়ালে তার ঈশ্বরসাধনার আপন ক্ষেত্র তৈরি হয়। শ্রীমার সাধনজীবন দেখলেই

আমরা এটি বুঝতে পারি। লজ্জা মানে ঘোমটা নয় অথবা কাউকে দেখে আড়ালে লুকিয়ে পড়া নয়, লজ্জা নারীর ব্যক্তিত্বের একটি স্নিগ্ধ প্রকাশ যার উদ্ভব ঘটে আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে। সে-ব্যক্তিত্ব নারীর প্রতি সম্ভ্রম জাগাতে সাহায্য করে। মহীয়সী নারীদের প্রতি জগৎ যে সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করে থাকে, তার পিছনে আছে তাঁদের লজ্জা নামক আত্মসংযমের শক্ত ভিত। নারীপুরুষের যৌথ কামনায় এই সংসার, তাই অনৈতিক জীবনের প্রতি ঘৃণাবোধ না থাকলে সংসারে বাঁধন থাকে না, শান্তি তো সুদূরপরাহত। আর এর সঙ্গে চাই লোকলজ্জার ভয়। এই ভয়টুকু আমাদের বহু প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করে। আমাদের জীবনযাপনে যে-ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা আছে তার প্রথমটি অর্থাৎ মানবধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই উপদেশটি। মানবধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যা মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে রেখেছে। পাশবিক স্তরে মানুষ আর পশুতে প্রভেদ নেই, কিন্তু জ্ঞান মানুষকে মানুষ করেছে, যে-জ্ঞান দিয়ে সে ভালমন্দ বিচার করতে পারে, যার অপর নাম বিবেক। মায়ের উপদেশটি —'তিন থাকতে হয়'—অধ্যাত্মপথের প্রথম ধাপ, আর ঠাকুরের কথাটি—'তিন থাকতে নয়'—শেষের ধাপ। গীতায় আছে—'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।/ যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥'—যে-কর্মের দ্বারা সাধক যোগারূঢ় হওয়ার সাধন করে, যোগে আরূঢ় হলে সেটির পরিত্যাগই সে-অবস্থার কারণ হয়। তেমনই, যে-তিনটি আয়ত্ত করে মানুষ মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই তিনটির পরিত্যাগই তার মোক্ষের সাধনের সূচনা করে।

টাকা মাটি মাটি টাকা

শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল মজা করে বলতেন, কথাটি সত্য মাটি কাটার কনট্রাক্টারের কাছে। কিন্তু কথাটি মজা করে বলা হলেও তার ব্যাবহারিক সত্যতা আছে। যিনি মাটি বিক্রি করছেন তিনি মাটিকে টাকায় রূপান্তরিত করছেন, আর যিনি কিনছেন তিনি নিজের টাকাকে মাটিতে পরিণত করছেন। যদি পারস্পরিকভাবে কোনও বস্তু একে অপরের পরিবর্ত হয় তাহলে তাদের মূলগত সত্তা একই। সুতরাং বস্তুগতভাবে যা, তা তত্ত্বগতভাবে হতেও বাধা নেই। ঠাকুরের সাধনপ্রক্রিয়ার এই উক্তিটি মৌলিক, কারণ এর আগে আমরা কোনও সাধক বা অবতারের জীবনে এরকম কোনও সাধনের উল্লেখ দেখি না। সাধনকালে ঠাকুরের বিশুদ্ধ মনে যা ঈশ্বরলাভের পথে বাধা বলে মনে হত তা তিনি নির্মমভাবে ত্যাগ করতেন। এই ত্যাগও শুধু মনে মনে করেই তৃপ্তি হত না, তার অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত তিনি স্থির হতে পারতেন না। পইতে ব্রাহ্মণ্য অভিমানের জনক ও দীনতার প্রতিবন্ধক এটি উপলব্ধি করে পঞ্চবটীতে ধ্যানের সময় সেটি খুলে বসতেন। তিনি রসিক মেথরের চেয়ে কোনও অংশে বড় নন—এই ভাব আনার জন্য তার বাড়ি গিয়ে তার শৌচাগার পরিষ্কার করে এসেছিলেন। সে জানতে পারলে তা করতে দেবে না বলে রাতের অন্ধকারে সেটি করে এসেছিলেন—এ-ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়তা এতটাই ছিল।

একইভাবে, অর্থ ঈশ্বরের পথের অনর্থ কারণ তা ভোগমুখী ও আসক্তির জনক এই জ্ঞানে, একদিন এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটি নিয়ে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকাই মাটি, মাটিই টাকা' বলতে বলতে দুটিই গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, এই অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর অর্থের প্রতি আসক্তি যেটুকু ছিল তা যেন উপড়ে গঙ্গায় বিসর্জিত হল। সেটি মনে এত সুদৃঢ় হল যে, টাকা হাতে দিলে হাত বেঁকে যেত, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকত। ধাতুদ্রব্যে হাত লাগলে হাত

কনকন করত। এ-বিষয়টি যখন আমরা পড়ি তখন আমাদের মনে হয় এটা কেমন বাড়াবাড়ি যেন, এতটা কি হতে পারে? আমরা এভাবে ভাবলে হয়তো একটু বুঝতে পারব। আমরা যখন আনমনা বসে থাকি, তখন যদি অজান্তে আমাদের হাত কোনও ঠান্ডা কুণ্ডলী-পাকানো কিছুর ওপর পড়ে তাহলে অসচেতনভাবেই হাত ছিটকে চলে আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ আমাদের সর্পভীতির সংস্কার এত দৃঢ় যে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী নিজের থেকেই এই প্রতিক্রিয়া করবে। ঠাকুরের মন এত সূক্ষ্ম ও পূর্বসংস্কারহীন ছিল যে, যেকোনও সাধন প্রক্রিয়ার প্রভাব মনে দৃঢ় হয়ে বসত। তাই টাকাপয়সার ওপর তীব্র অনীহা তাঁর স্নায়ুর ওপর এতটাই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু আমরা কি এভাবে আসক্তি মুক্ত হতে পারব? সম্ভাবনা কম, কারণ হাজারবার টাকাকে মাটি বলে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেও তার আকর্ষণ আমাদের মন থেকে যাবে না। ঠাকুর তা জানেন, তাই বলতেন, ''আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর''—অর্থাৎ আমি তপস্যা বলতে যা বোঝায় তার ষোলোগুণ করে সিদ্ধির দ্বারকে তোদের সামনে এনে দিয়েছি, তোরা তার একভাগ করলেই সিদ্ধিলাভ করবি। আরও বলতেন, ''এখানের সব নজিরের জন্য।'' অর্থাৎ তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, আমরা তার যত অনুসরণ করতে পারব ততই উন্নত হব।

আমাদের মনে হবে, বেঁচে থাকতে টাকা তো অবশ্যই চাই, সেটা অস্বীকার করব কী করে? ঠাকুরও অস্বীকার করেননি, তবে মনে রাখতে বলেছেন, ''টাকায় কি হয়? ডাল-ভাত হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, কিন্তু টাকা ঈশ্বর দিতে পারে না।'' তিনি তাঁর মতো টাকা ছুঁতে বারণ করেননি, অর্থের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে বলেছেন। আমাদের টাকায় আসক্তি, তার কারণ টাকা আমাদের সুখ দিতে পারে এই ধারণা এবং এই ধারণার বশেই টাকা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যি কি তাই হয়! তাহলে তো এ-জগতে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুখেরও বৃদ্ধি হত! বরং উলটোটাই তো দেখি। সম্পদশালী মানুষের সমস্যা অনেক বেশি, তাই দুঃখও বেশি। এ নিয়ে একটি মজার গল্প আছে। এক জেলে দুপুরে তার নৌকোয় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একজন ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল তাকে বলল, ''তুমি এই কাজের সময় ঘুমোচ্ছ! কোথায় মাছ ধরে রোজগার বাড়াবে তা নয়, ঘুম?'' জেলে বলল, ''আজ ভোর থেকে অনেক মাছ ধরেছি, তা বাজারে দিয়ে ভালই লাভ হয়েছে তাই ঘুমোচ্ছি।'' প্রফেশনাল বলল, ''তাতে কী? আরও রোজগার হলে এই নৌকোটা বড় করে মাছ বেশি ধরতে পারবে, তারপর সেই টাকা দিয়ে ট্রলার কিনে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে অনেক লাভ করতে পারবে।'' জেলে জিজ্ঞাসা করল, ''আচ্ছা, অনেক পয়সা হওয়ার পর কী করব?'' প্রফেশনাল বলল, ''তখন আরাম করে ঘুমোতে পারবে।'' জেলে হেসে বলল, ''আমি তো তা-ই করছিলাম, তার জন্য অনেক টাকা করার দরকার কী?'' সুতরাং, উদ্দেশ্য যখন ভোগের চেয়ে জীবনে দুর্ভোগের ভাগই বেশি করে তোলে তখন এই উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। তাই ঠাকুর আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটি স্থির করে দিয়ে বলেছেন, ''ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।''

মাস্টারমশাই একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন বেশি রোজগারের জন্য চেষ্টা করা যায় কী না। ঠাকুর বলেছিলেন, ''বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়''—যে-সংসারে নিজের জন্য নয়, তবে ঈশ্বরসেবা—ঈশ্বরজ্ঞানে সকলের সেবা হয় সেই সংসারের জন্য পারা যায়। মাস্টারমশাই তাই করেছিলেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর দু-তিন জায়গায় পড়াতেন, তার একটি বরানগর মঠে খরচের জন্য, অপরটি শ্রীমায়ের সেবার জন্য, বাকি তাঁর সংসার খরচের

জন্য। ঠাকুর আরও বলেছিলেন, ‘‘উগুনোর জন্য এত ভেবো না। সাঁকোর তলা দিয়ে জলের মতো টাকা একদিক দিয়ে আসবে আর একদিক দিয়ে সৎকাজে বেরিয়ে যাবে।’’ আমরা ফিরে তাকালে দেখতে পাই, সারাজীবন কত টাকা এসেছে আবার চলেও গেছে, কিন্তু সঞ্চয়ের চেষ্টায় আমরা কেবল উদ্বেগই সঞ্চয় করেছি—‘লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গ-চপলা’, তার চাপল্যকে রোধ করতে পারিনি। এটি সজ্ঞানে করতে পারলে ফল অন্যরকম হত। স্রোতের জলে যেমন নোংরা জমতে পায় না, তেমনি সদ্‌ব্যয়ে টাকার প্রতি মনে আসক্তির মালিন্য লাগতে পারে না। হাত খুললে হৃদয় খোলে আর সংসারে আসক্তি কমতে থাকে। বলরামবাবু সেই অর্থে ধনী ছিলেন না, কারণ তাঁকে জমিদারির ভাগের মাসোহারাতে সংসার চালাতে হত। কিন্তু সকলের জন্য না পারলেও ঠাকুরের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করতেন। তাঁর বাড়িকে ঠাকুর তাঁর কলকাতার কেল্লা বলতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁর বাড়ি ছিল পার্ষদ মহারাজদের অবারিত আশ্রয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ সাধুরা দিনের পর দিন কাটাতেন সেখানে। একবার লাটু মহারাজ বলরামবাবুর জীর্ণ বিছানা দেখে অনুযোগ করলে তিনি উত্তরে বলেন, এ-মাটির দেহ মাটিতে যাবে, কিন্তু বিছানার পয়সা সাধুভক্তের সেবায় খরচ হবে। টাকার অপর নাম অর্থ, অনর্থ নয়। টাকাকে ভোগের উপকরণ করলে তা হয় টাকাকে ‘মাটি’ করা, যা অনর্থবিশেষ; আর দেহসুখকে উপেক্ষা করে ‘মাটির দেহ মাটিতে যাবে’ ভাবনায় তার সদ্‌ব্যবহার করলে তা হয় তাকে টাকা করে তোলা, যা জীবনকে অর্থপূর্ণ করে। *ক্রমশ*

এবার প্রচ্ছদ

গুরু, গীতা, গায়ত্রী, গঙ্গা—সনাতন ভারতবর্ষের সাধনজীবনের পরম পবিত্র পরম্পরা। শ্রীহরিপাদপদ্ম-বিগলিতা সুরনদী গঙ্গা মর্ত্যে নেমেছিলেন শাপে ভস্মীভূত ষাট হাজার সগরপুত্রকে উদ্ধার করতে। সেই থেকে তিনি আছেন ভারতবর্ষের প্রাণপ্রবাহ হয়ে। মর্ত্যমানবকে ছেড়ে করুণার্দ্র-অন্তরা আর ফিরে যাননি। ধরণীর ধূলিকে ধন্য করতে তিনি ত্যাগ করেছেন সেই দেবলোক—যেখানে কিনা আনন্দাশ্রু ছাড়া কান্না নেই, প্রণয়কলহ ছাড়া বিরহ নেই, যৌবন ছাড়া বয়স নেই। বরং এ-দীন মরলোককেই দেবী সুরলোকে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর করুণাতরঙ্গ কত মরুপ্রান্তরকে এনে দিয়েছে শস্যশ্যামল সমৃদ্ধি, তাঁর লীলায়িত গতিবিভঙ্গে রূপ নিয়েছে শতসহস্র তীর্থ, কত বাণিজ্যনগরী। জেগে উঠেছে ‘গঙ্গাহৃদি’ সভ্যতা। সর্বোপরি, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। সাক্ষাৎ পতিতোদ্ধারিণী, মোক্ষদায়িনী তিনি। গঙ্গাস্নান দশবিধ পাপ হরণ করে। গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্পর্শ, গঙ্গাজল পান, এমনকী গঙ্গাদর্শনও ভারতীয় ঐতিহ্যে মহাফলদায়ী, ঐশী জীবন যাপনের সহায়ক। একক্ষণেই দেবীজননী সন্তানের পাপ ও দুঃখ নাশ করেন, তাই তিনি ‘সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী’। হরিদ্বার-হৃষীকেশের নির্মলতা কলকাতার গঙ্গায় না থাকলেও গঙ্গার পাবনীশক্তি কমে যায় না। যুগযুগ-বাহিনী সুরধুনী আজও পুরাণযুগের মতো সমভাবেই ‘ত্রিভুবনতারিণী।’ গঙ্গাকে অন্তরে ধারণ করে ভারতের সাহিত্য ও শিল্পজগৎ উন্মোচন করেছে নবদিগন্ত। এবারের প্রচ্ছদে মকরবাহিনীর একটি প্রাচীন চিত্র।